সরকারি ধান সংগ্রহেও দলীয় টোকেন, প্রান্তিক চাষীরা বঞ্চিত

মেহেরপুর সদর উপজেলায় চলতি মৌসুমে সরকার নির্ধারিত ৩৬ টাকা কেজি দরে ৭৩০ টন ধান সংগ্রহের যে কার্যক্রম শুরু হয়েছে, তার ভেতরে যে চিত্র উঠে এসেছে তা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। অভিযোগ উঠেছে, খাদ্যগুদামে ধান বিক্রি করতে হলে কৃষকদের এখন আর শুধু কৃষি অফিসের প্রত্যয়নপত্র যথেষ্ট নয়—লাগছে রাজনৈতিক দলের নেতাদের দেওয়া বিশেষ “টোকেন” বা স্লিপ। বিএনপির দুই গ্রুপ ও জামায়াতে ইসলামীর মধ্যে ৬০-৪০ অনুপাতে ভাগাভাগির যে সমন্বয় হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে, তা প্রকারান্তরে রাষ্ট্রীয় কর্মসূচিকে দলীয় সম্পত্তিতে পরিণত করার শামিল।

এটি কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। সরকারি ধান-চাল সংগ্রহ অভিযান বরাবরই সিন্ডিকেট ও স্বজনপ্রীতির অভিযোগে জর্জরিত থেকেছে—শাসক দল বদলেছে, কিন্তু প্রক্রিয়াটি বদলায়নি বলেই মনে হচ্ছে। কালাচাঁদপুর গ্রামের কৃষক শান্তর অভিজ্ঞতা এক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্বমূলক। প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও কৃষি অফিসের প্রত্যয়ন থাকা সত্ত্বেও প্রায় এক মাস ধরে তিনি ধান বিক্রি করতে পারেননি, কারণ তার কাছে রাজনৈতিক স্লিপ নেই। অথচ যিনি দলীয় মাধ্যমে যোগাযোগ করতে পেরেছেন, তিনি ঠিকই ধান দিতে পেরেছেন। এই বৈষম্য সরাসরি সরকারের কৃষিবান্ধব নীতির বিরুদ্ধে যায়—যে নীতির মূল লক্ষ্যই হলো প্রান্তিক চাষীদের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করা।

আরও উদ্বেগের বিষয়, সংশ্লিষ্ট গুদাম কর্মকর্তা নিজেই কার্যত স্বীকার করেছেন তিনি “হুকুমের গোলাম”। অর্থাৎ প্রশাসনিক কাঠামোর ভেতরেই এই অনিয়ম প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নিয়েছে এবং তা উপজেলা পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট কমিটির সিদ্ধান্ত হিসেবেই পরিচালিত হচ্ছে বলে জানা যাচ্ছে। এর অর্থ দাঁড়ায়, একজন নিচু পদের কর্মকর্তাকে একা দায়ী করে বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই—দায় বর্তায় পুরো তদারকি কাঠামোর ওপর।

উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক স্পষ্ট করেই বলেছেন, প্রান্তিক চাষীদের বাদ দিয়ে অন্য কারো কাছ থেকে ধান নেওয়ার কোনো সুযোগ নেই।

কিন্তু কথা আর বাস্তবতার মধ্যে যে বিস্তর ফারাক, তা এই প্রতিবেদনই প্রমাণ করে। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা অভিযোগ পেলে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন এবং আমরা আশা করি এ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

৪ জুন পর্যন্ত মাত্র ১১৪ টন ধান সংগ্রহ হয়েছে, যেখানে লক্ষ্যমাত্রা ৭৩০ টন এবং সময়সীমা ৩১ আগস্ট। লক্ষ্যমাত্রা পূরণের চাপ যদি প্রকৃত উৎপাদনকারী কৃষকদের পরিবর্তে রাজনৈতিকভাবে সংযুক্ত মধ্যস্বত্বভোগীদের হাতে চলে যায়, তবে সরকারের শত কোটি টাকার ভর্তুকি কর্মসূচি তার মূল উদ্দেশ্য থেকে সম্পূর্ণ বিচ্যুত হবে।

অবিলম্বে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের উচিত ধান সংগ্রহ প্রক্রিয়াকে সম্পূর্ণ স্বচ্ছ ও তালিকাভিত্তিক করা—যাতে কোনো রাজনৈতিক দল বা ব্যক্তির হস্তক্ষেপের সুযোগ না থাকে। কৃষকের ঘামে ফলানো ফসলের ন্যায্যমূল্য পাওয়ার অধিকার কোনো দলীয় টোকেনের মুখাপেক্ষী হতে পারে না।

কোটচাঁদপুরে ১৩ হাজার ৫৫৫ জন ভাতাভোগী ঈদের খুশি থেকে বঞ্চিত

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর উপজেলার সলেমানপুর গ্রামের প্রতিবন্ধী নজির উদ্দিন। স্ত্রী ও এক সন্তান নিয়ে তার সংসার। প্রতিবন্ধী হয়েও ভ্যান চালিয়ে কোনো রকমে জীবিকা নির্বাহ করেন তিনি। ঈদের আগেই প্রতিবন্ধী ভাতার টাকা পাবেন এই আশায় ছিলেন নজির উদ্দিন। সেই টাকা পেলে পরিবার নিয়ে ভালোভাবে ঈদ উদযাপন করবেন বলেও ভেবেছিলেন।

কিন্তু ঈদের আর মাত্র একদিন বাকি থাকলেও এখনও ভাতার টাকা পাননি তিনি। এরই মধ্যে ব্যাংকসহ সংশ্লিষ্ট অফিস বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ভাতা পাওয়ার আশা অনেকটাই অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

শুধু নজির উদ্দিন নন, কোটচাঁদপুর উপজেলার এমন ১৩ হাজার ৫৫৫ জন ভাতাভোগী রয়েছেন, যাদের অধিকাংশই এই ভাতার টাকার ওপর নির্ভরশীল। সময়মতো টাকা না পাওয়ায় তারা ঈদের আনন্দ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।

কোটচাঁদপুর উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা বশির আহম্মেদ জানান, উপজেলায় মোট ১৩ হাজার ৫৫৫ জন ভাতাভোগী রয়েছেন। এর মধ্যে ৬ হাজার ২০৬ জন বয়স্ক, ২ হাজার ৯৭০ জন বিধবা এবং ৪ হাজার ৩৭৯ জন প্রতিবন্ধী ভাতাভোগী।

তিনি বলেন, “প্রত্যেকের ঈদের আগে তিন মাসের ভাতার টাকা পাওয়ার কথা ছিল। সে অনুযায়ী ৩ মার্চ ভাতার টাকা সাবমিট করা হয়। কিন্তু এখনো কেন ভাতাভোগীরা টাকা পাননি, তা বুঝতে পারছি না।”

তিনি আরও জানান, পাশের কালীগঞ্জ উপজেলায় শুধু বয়স্ক ভাতার টাকা প্রদান করা হয়েছে, অন্য ভাতাগুলো এখনও দেওয়া হয়নি।
এদিকে ভাতাভোগীদের অনেকে সমাজসেবা অফিসে এসে খোঁজখবর নিয়েছেন। তাদের ঈদের আগেই টাকা পৌঁছাবে বলে আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল বলে জানান তিনি। এ বিষয়ে দায়ী কে এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, “সমাজসেবা অধিদপ্তর দায়ী হতে পারে, কারণ আমরা নির্ধারিত সময়েই ভাতার টাকা সাবমিট করেছি।” ভাতাভোগীরা টাকা না পাওয়ায় তিনিও দুঃখ প্রকাশ করেন।

এ বিষয়ে জেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা আব্দুল মমিনের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি ফোন রিসিভ না করায় কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

কোটচাঁদপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) এনামুল হাসান বলেন, “এ বিষয়টি সমাজসেবা অফিস দেখভাল করে। যদি ভাতার টাকা পাওয়ার কথা থাকে, তাহলে আজ বা কাল না পেলেও ঈদের পর পাওয়া যাবে না পাওয়ার কোনো সুযোগ নেই।”

তিনি আরও বলেন, “সমাজসেবা কর্মকর্তার সঙ্গে কথা বলেছি। অধিদপ্তরের নির্দেশনা অনুযায়ী ৩ তারিখের মধ্যে ভাতার তথ্য সাবমিট করা হয়েছে। তবে ঈদের আগে টাকা দেওয়ার বিষয়ে কোনো নিশ্চয়তা ছিল না। আমাদের পক্ষ থেকে সময়মতো সব করা হয়েছে, কিন্তু অধিদপ্তর থেকে টাকা দেওয়া সম্ভব হয়নি।”

ভাতাভোগীরা ঈদের আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন কিনা এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, “আমি এ বিষয়ে একমত। ঈদের আগে টাকা পেলে তারা

খুশি হতেন। এখন যদি না পান, তার সঠিক ব্যাখ্যা অধিদপ্তরই দিতে পারবে।”

দর্শনায় ভিজিএফের চাল থেকে বঞ্চিত দরিদ্ররা, কাদতে কাদতে ফিরলেন বৃদ্ধ-বিধবারা

দর্শনা পৌরসভার ভিজিএফের চাল বিতরণে তালিকা জটিলতা, অস্বচ্ছতা ও অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। বিশেষ করে পৌরসভার ৩, ৪ ও ৭ নম্বর ওয়ার্ডে প্রকৃত দরিদ্র, বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা ও অসহায় অনেক মানুষ চাল না পেয়ে কাদতে কাদতে বাড়ি ফিরে গেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। অন্যদিকে অভিযোগ রয়েছে, কিছু সচ্ছল ব্যক্তি ও ব্যবসায়ীও এই ভিজিএফের চাল পেয়েছেন, যা নিয়ে স্থানীয়দের মধ্যে ক্ষোভ ও সমালোচনা দেখা দিয়েছে।

পৌরসভা সূত্রে জানা যায়, দর্শনা পৌরসভার ৯টি ওয়ার্ডের উপকারভোগীদের জন্য কার্ডপ্রতি ১০ কেজি করে ভিজিএফের চাল বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। সে অনুযায়ী: ১ নম্বর ওয়ার্ডে ৩৩৫ জনের জন্য ৩,৩৫০ কেজি, ২ নম্বর ওয়ার্ডে ৩৯০ জনের জন্য ৩,৯০০ কেজি, ৩ নম্বর ওয়ার্ডে ৩৩৫ জনের জন্য ৩,৩৫০ কেজি, ৪ নম্বর ওয়ার্ডে ৩৩৩ জনের জন্য ৩,৩৩০ কেজি, ৫ নম্বর ওয়ার্ডে ৩৪২ জনের জন্য ৩,৪২০ কেজি, ৬ নম্বর ওয়ার্ডে ৩৪২ জনের জন্য ৩,৪২০ কেজি, ৭ নম্বর ওয়ার্ডে ২৮৩ জনের জন্য ২,৮৩০ কেজি, ৮ নম্বর ওয়ার্ডে ৩৯৭ জনের জন্য ৩,৯৭০ কেজি এবং ৯ নম্বর ওয়ার্ডে ৩২৮ জনের জন্য ৩,২৮০ কেজি বরাদ্দ রয়েছে।

মোট ৯টি ওয়ার্ডে ৩,৮৫০ জন উপকারভোগীর জন্য ৩০,৮৫০ কেজি চাল বরাদ্দ রয়েছে। গতকাল বুধবার সকাল থেকে দুপুর তিনটা পর্যন্ত ৩, ৪ ও ৭ নম্বর ওয়ার্ডের ভিজিএফের চাল বিতরণ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

স্থানীয়রা জানান, ৩ মার্চ দর্শনা পৌর কর্তৃপক্ষ ৯টি ওয়ার্ডের রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দকে নিয়ে একটি সভা করেন। ওই সভায় সিদ্ধান্ত হয়, দুই থেকে তিন দিনের মধ্যে প্রকৃত সুবিধাভোগীদের

তালিকা প্রস্তুত করে পৌরসভায় জমা দিতে হবে। কিন্তু অভিযোগ রয়েছে, এক সপ্তাহ পার হলেও অনেক ওয়ার্ডে তালিকা সম্পূর্ণ হয়নি এবং কোথাও অতিরিক্ত নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যা কার্যক্রমে জটিলতা সৃষ্টি করেছে।

ভিজিএফের চাল বিতরণের সময় দেখা যায়, তালিকায় নাম না থাকায় অনেক অসহায় মানুষ চাল পাননি। ভুক্তভোগীদের মধ্যে অনেকেই বয়োবৃদ্ধ, কেউ বিধবা, কেউ স্বামী পরিত্যক্তা, আবার কেউ এমন আছেন যারা চলাফেরা করতে পারেন না বা ভিক্ষাবৃত্তি করে জীবনযাপন করেন। তাঁরা কাদতে কাদতে ফিরে গেছেন।

অভিযোগ রয়েছে, বিতরণের সময় বিভিন্ন অনিয়মও হয়েছে। একজন মহিলা একাই ১৭টি টোকেন বা কার্ড নিয়ে চাল নিতে আসেন। পৌর কর্মচারী শাহ আলম তাৎক্ষণিকভাবে টোকেনগুলো আটক করেন। এছাড়া কিছু সচ্ছল ব্যক্তি এই ভিজিএফের চাল পেয়েছেন, যেমন কেরু অ্যান্ড কোম্পানিতে চাকরি করেন এমন কয়েকজন এবং বাজারে কাপড়ের ব্যবসা করেন এমন কয়েকজন।

দামুড়হুদা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও দর্শনা পৌর প্রশাসক শাহিন আলম জানান, সব রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সমন্বয় করে প্রকৃত উপকারভোগীদের কাছে চাল পৌঁছে দিতে প্রতিটি ওয়ার্ডে একজন করে পৌর কর্মচারী দায়িত্ব পেয়েছেন। তবে কিছু ওয়ার্ডের তালিকা এখনো সম্পূর্ণ হয়নি, ফলে পুরো চাল বিতরণ শেষ করতে আরও দুই থেকে তিন দিন সময় লাগতে পারে।

প্রকৃত দরিদ্র ও অসহায়দের দাবি, তালিকা পুনরায় যাচাই করে যারা সত্যিকারের প্রাপ্য, তাদের নাম অন্তর্ভুক্ত করে দ্রুত ভিজিএফের চাল বিতরণের ব্যবস্থা করা হোক। অনিয়মের সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিলে ভবিষ্যতেও এ ধরনের বৈষম্য ও অভিযোগ থাকবে।

কোটচাঁদপুর পৌরবাসী নাগরিক

সেবা থেকে বঞ্চিত

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর পৌরসভার অধিকাংশ এলাকাই আজ নাগরিক দুর্ভোগের প্রতীক। পৌর এলাকার রাস্তাঘাটের বেহাল অবস্থা, ড্রেনেজ ব্যবস্থার অকার্যকারিতা এবং সড়কবাতির অপ্রতুলতায় নাগরিক জীবন বিপর্যস্ত হয়ে উঠেছে।
বৃষ্টি হলে রাস্তাগুলো যেন রূপ নেয় কাদা-পানিতে ভরা ফাঁদে। সড়কজুড়ে খানাখন্দে চলাচল হয়ে পড়ে কষ্টসাধ্য। সন্ধ্যা নামতেই ডুবে যায় ঘোর অন্ধকারে, অধিকাংশ সড়কে জ্বলে না সড়কবাতি। পৌরসভার সামনের সড়কেও নিয়মিত যানজট লেগে থাকে, যা প্রশাসনের উদাসীনতার জীবন্ত প্রমাণ।
নাগরিকরা নিয়মিত পৌরকর পরিশোধ করলেও সেবার দেখা মিলছে না। ভাঙাচোরা রাস্তা, নষ্ট ড্রেন, অপ্রতুল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, সব মিলিয়ে পৌরসভার অবস্থা করুণ। স্থানীয়রা অভিযোগ করছেন, উন্নয়ন প্রকল্পগুলো বাস্তবতা ও প্রয়োজনের প্রতিফলন ঘটায় না। তারা বলছেন, সেবার নামে যেন চলছে প্রহসন।
এ নিয়ে নাগরিক সমাজের ক্ষোভ প্রবল। সচেতন মহলের দাবি, কোটচাঁদপুর পৌরসভা যেন বর্তমানে নাগরিক ভোগান্তির এক প্রদর্শনীতে পরিণত হয়েছে। নির্বাচিত মেয়র ও কাউন্সিলর না থাকায় সেবার মান আরও নাজুক হয়ে পড়েছে। যারা বর্তমানে দায়িত্বপ্রাপ্ত, তারা নাগরিক সেবা নিশ্চিত করতে ব্যর্থ।
স্থানীয়রা জানান, বছরের পর বছর সড়ক সংস্কার হয়নি। অনেক স্থানে বিদ্যুৎ থাকলেও সড়কবাতি নেই। রাত হলেই গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলো অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়। পৌরসভার পরিচ্ছন্নতা, পানি নিষ্কাশন, ড্রেনেজ ব্যবস্থা—সবখানেই চরম অব্যবস্থা বিরাজ করছে।
যেখানে এটি একটি প্রথম শ্রেণির পৌরসভা, সেখানে নাগরিক সেবার মান যেন তৃতীয় শ্রেণির। অনেকেই বলছেন, ইউনিয়ন পরিষদের সেবাও এর চেয়ে ভালো। একদিকে নাগরিক অধিকার ও কর পরিশোধ, অন্যদিকে প্রশাসনের চূড়ান্ত দায়হীনতা—এই বৈপরীত্যে প্রশ্ন উঠছে, এই পৌরসভা কি শুধুই কর আদায়ের একটি যন্ত্র?
প্রায় ১ লাখ ২০ হাজার মানুষের বসবাস এই পৌরসভায়। কিন্তু তাদের অধিকাংশই প্রতিনিয়ত নানা সমস্যার মুখোমুখি। বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে দেখা গেছে, খানাখন্দে ভরা সড়ক বর্ষা মৌসুমে হয়ে ওঠে মৃত্যুফাঁদ। স্থানীয় মানবাধিকার কর্মী ও সাংবাদিক রেজাউল করিম বলেন, “প্রতিদিন রাস্তায় চলতে গিয়ে পায়ে কাদা লাগে, কেউ কেউ পড়ে গিয়ে আহত হন। কর দেই, কিন্তু সেবা কোথায়? পৌরসভার লোকজন শুধু কর তুলতেই ব্যস্ত, কিন্তু কাজের সময় তাদের পাওয়া যায় না।”
ঈশী খোন্দকার জানান, “সরকারি কলেজ ও খোন্দকার পাড়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ সড়কে এক সপ্তাহ ধরে সড়কবাতি জ্বলছে না। কাউন্সিলর ও পৌর কর্তৃপক্ষকে জানিয়েও কোনো লাভ হয়নি। তাহলে আমরা কী সেবা পাচ্ছি?”

নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি আল-মামুন বলেন, “নামমাত্র উন্নয়নের অভিনয় দিয়ে জনগণকে বেশি দিন বোকা বানানো যাবে না। সময় এসেছে টেকসই পরিকল্পনার মাধ্যমে এগিয়ে যাওয়ার।”
এ বিষয়ে পৌরসভার সরকারি প্রকৌশলী মাসুদ রানা বলেন, “সড়কের বাতি ইতোমধ্যে কিছু স্থানে স্থাপন করা হয়েছে। নতুন করে আবার টেন্ডার হয়েছে। আমি সদ্য জয়েন করেছি, পুরো শহর এখনো দেখা হয়নি। পুরাতন ড্রেনগুলো সংস্কার করলে পানি নিষ্কাশনের কিছুটা উন্নতি হবে। নতুন ড্রেন করতে হলে সময় লাগবে। বরাদ্দ সীমিত হলেও কাজ চলমান রয়েছে।”
এ বিষয়ে জানতে কোটচাঁদপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও পৌর প্রশাসক কাজী আনিসুল ইসলামের সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি ফোন রিসিভ না করায় তার বক্তব্য নেওয়া সম্ভব হয়নি।

রাস্তার বেহাল দশা! নাগরিক সেবা বঞ্চিত ঝিনাইদহ পৌরবাসী

মাসের পর মাস সুয়ারেজ লাইনের ময়লা পানিতে নিমজ্জিত হয়ে আছে ঝিনাইদহ পৌরসভার ৫নং ওয়ার্ডের উপশহর পাড়া এলাকার রাস্তা ঘাট। আশপাশের বাড়িঘর ও টয়লেটের ময়লা পানি এসে ড্রেনেজের মুখ উথলে উপচে পড়ছে সড়কে। ড্রেন ছুঁয়ে পানি রাস্তায় বের হচ্ছে অনবরত। সেই পানি সড়কে জমেছে প্রায় হাঁটু সমান। ভাঙাচোরা রাস্তা আর কাঁদাঁ পানির কারণে চরম দুর্ভোগে পড়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। কিন্তু সড়ক ও ড্রেন সংস্কারে কোনো উদ্যোগ নিচ্ছে না পৌর কর্তৃপক্ষ।

আজ বুধবার (৬ নভেম্বর) উপশহর পাড়া এলাকায় সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায়, মহল্লার অলিগলি ও সড়কগুলোতে পানি থৈ থৈ করছে। কোথাও কোথাও পানি হাঁটু সমান। পানি বের হওয়ার ড্রেনেজ ব্যবস্থা না থাকায় সামান্য বৃষ্টিতেই পানি জমে গিয়ে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়েছে। ময়লা পানির ভ্যাপসা দুর্গন্ধসহ ডেঙ্গু ও পোকামাকড় সৃষ্টি হচ্ছে, বাড়ছে স্বাস্থ্য-ঝুঁকিও। পথচারী ও স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, ড্রেনের ঢাকনা ভাঙা ও ঢাকনা না থাকায় মানুষের যাতায়াত এবং যানবাহন চলাচলের ক্ষেত্রে দুর্ভোগ সৃষ্টি হচ্ছে। এছাড়া ড্রেন পরিচর্যা না করার ফলে ময়লা-আবর্জনা আটকে স্তুপ হয়ে আছে, যার ফলে

ড্রেনের পানি বা ময়লাগুলো স্থানান্তরিত হয় না। এতে সামান্য বৃষ্টিতে রাস্তার অলিগলিতে পানি জমে থাকে যা বাসিন্দাদের চলাচলে চরম ভোগান্তি সৃষ্টি করে।

পৌরসভার ৫নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা রেশমা খাতুন বলেন, নামেই পৌরসভায় বাস করি আমরা। রাস্তা-ঘাটের বেহালদশা। নেই সড়কে বাতির ব্যবস্থাও। সন্ধ্যা নামলেই যেন তৈরি হয় ভুতুড়ে পরিবেশ। মাসের পর মাস সুয়ারেজের পানি রাস্তায় উপচে পড়লেও দেখার যেন কেউ নেই!

অভিযোগ করে সাইফুল ইসলাম নামে এক যুবক বলেন, পৌরসভার উপশহর পাড়ার এলাকাবাসী যেন অভিভাবকহীন বাসিন্দা। পৌরসভার সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত তারা।

আরেক বাসিন্দা জিকু হাসান জানান, এ এলাকায় কোন সুস্থ মানুষের বসবাসের মতো অবস্থা নেই। বৃষ্টি ও বাতাসে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে পুরো এলাকায়। সুয়ারেজের ময়লা পানিতে বংশবিস্তার করছে মশা মাছি। ময়লা-পানির কারণে মশা-মাছির মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে ডায়রিয়া, ডেঙ্গু জ্বরসহ বিভিন্ন রোগ।

পৌর শহরে চলাচলকারী একাধিক অটোরিকশা চালক জানান, উপশহর পাড়ায় ড্রেনেজ ব্যবস্থা নাজুক থাকায় সামান্য বৃষ্টিতে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়। এছাড়াও সড়কের বেহাল দশার কারণে রিকশা চালাতে খুব কষ্ট হয় তাদের। মাঝেমধ্যেই রিকশার চাকা ভেঙ্গে যায়। যাত্রীরাও অনেক সময় রিকসায় উঠতে ভয় পান।

ওই এলাকার আরেক বাসিন্দা আজিজুর রহমান জানান, সামান্য বৃষ্টি হলেই রাস্তায় পানি জমে যায় কিন্তু পানি সরানোর কোন ব্যবস্থা নেই। ড্রেনগুলো ভরাট হয়ে যাওয়ার ফলে ড্রেনের ময়লা আবর্জনা উপচে পড়ে সড়কে উঠে যাওয়ায় বারোমাস সড়কে জলাবদ্ধতা থাকে। এতে করে রাস্তায় ভাঙ্গন দেখা দিয়েছে।

এ ব্যাপারে পৌরসভার ৫নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মোঃ সাইফুল ইসলাম বলেন, ড্রেনটি অকেজো হওয়ায় পানি বের হবার কোনো পথ নেই। ময়লা আবর্জনা প্রতিনিয়ত ড্রেনে ফেলার কারণে পানি নিষ্কাশনে বাঁধা সৃষ্টি হচ্ছে। তবে জনদুর্ভোগ কমাতে দ্রুত টেকসই ড্রেন নির্মাণ ও সড়ক সংস্কার করা হবে।

এ বিষয়ে ঝিনাইদহ পৌরসভার নির্বাহী প্রকৌশলী মোঃ কামাল উদ্দীন বলেন, ওখানে কোনো ড্রেনেজ ব্যবস্থা না থাকায় পানি জমে আছে।

শুনেছি জলাবদ্ধতা আর খানাখন্দে সড়কটি এখন বেহাল দশায় পরিণত হয়েছে। নতুন করে টেন্ডার করা হচ্ছে প্রকল্প আসলে দ্রুত কাজ বাস্তবায়নের জন্য জরুরীভাবে উদ্যোগ নেয়া হবে।

কোটচাঁদপুরের রমজান আলী শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত

শিক্ষককের রোষানলে পড়ে শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হয়েছেন, রমজান আলী (১৩)।

এমন অভিযোগ তুলেছেন তাঁর পিতা আলী হোসেন। এ ঘটনাটি ঘটেছে কোটচাঁদপুরের কাগমারি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। বিষয়টি তদন্ত পূর্বক ব্যবস্থা গ্রহনের দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী। জানা যায়, ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর কাগমারি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ১৯৮৯ সালে। বিদ্যালয়ের পাশেই বাড়ি আলী হোসেনের।

ওনার দুই ছেলে। নুরনবী ও রমজান আলী। রমজান আলীর বয়স এখন ১৩ বছর। এ সময় তাঁর ৬ ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ার কথা থাকলেও গন্ডি পেরুতে পারেনি প্রাইমারীর। এখন সে ভবঘুরের মত করে ঘুরে বেড়ান। আর পিতার কাজের সহায়তা করে সময় পার করেন। এ ব্যাপারে রমজান আলীর পিতা আলী হোসেন বলেন, আমার বাড়ি বিদ্যালয়ের সামনেই। বিদ্যালয়টি যে সময় প্রতিষ্ঠিত সে সময় আমরা অনেক সহায়তা করেছি। সেই বিদ্যালয়ে এখন আমার ছেলে পড়াতে পারছিনা। তিনি অভিযোগ করে বলেন, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক (ভারপ্রাপ্ত) আব্দুর রহিমের রোষানলে পড়ে আমার ছেলের জীবন আজ শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হয়েছে। তিনি বলেন, আমার ছেলে একদিন বিদ্যালয়ে একটু দুষ্টুমি করেছিল। এরপর ওই শিক্ষক বিদ্যালয় থেকে বের করে দেন। সে থেকে বিদ্যালয় যাওয়া বন্ধ আমার ছেলে রমজানের। এরপরও ২/৩ বার আমার স্ত্রী ও আমি ছেলেকে বিদ্যালয়ে ভর্তি নেওয়ার কথা বলেছি। তারপরও তিনি ভর্তি নেননি।

তিনি আরো বলেন, যে সময় তাঁর বিদ্যালয়ে পড়ার কথা। এখন সে বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে না পেরে সারাদিন ভব ঘুরের মত করে ঘুরে বেড়ান

আর কোন সময় আমার কাছের সহায়তা করেন। ওই শিক্ষকের রোষানলে পড়ে আজ আমার ছেলে শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হয়েছে। আমি শিক্ষকের অপসারণ দাবী করছি। একই অভিযোগ করেছেন বিদ্যালয়ের পাশের আরেক অভিভাবক ওয়াজ উদ্দিন। সে রিয়াজ হোসেনের পিতা। তিনি বলেন,আমার ছেলেকেও ওই শিক্ষক বিদ্যালয়ে ভর্তি নেননি। আমি অনেকবার চেষ্টা করেও পারেনি ভর্তি করাতে। তিনি প্রশ্ন ছুড়ে দেন গণমাধ্যম কর্মীদের উপর।বলেন,আপনারাই বলেন বাড়ির সামনে বিদ্যালয় থাকতে কেউ ছেলে মাদ্রাসায় ছেলে মেয়ে কে ভর্তি করান। আমাকে সেটাই করতে হয়েছে। আর তা করতে হয়েছে প্রধান শিক্ষক আব্দুর রহিমের কারনে।

তিনি আরো বলেন, তিনি স্থানীয় শিক্ষক হওয়ায় বিদ্যালয়ে দাপট দেখান। ওনার খেয়াল খুশি মত করে বিদ্যালয় চালান। তিনি ওই শিক্ষকের অপসারণ করে বিদ্যালয়ের শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে সংশ্লিষ্টদের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন। তবে এ সব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন,বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক (ভারপ্রাপ্ত) আব্দুর রহিম। তিনি বলেন, এ সব মিথ্যা কথা। ওই শিক্ষকের বিরুদ্ধে তারা ষড়যন্ত্র করছেন বলেও দাবি করেছেন ওই শিক্ষক। এ ব্যাপারে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা সাকি সালাম বলেন,অনেকেই বিদ্যালয় ছেড়ে মাদ্রায় চলে যাচ্ছেন। আবার অনেকে ফিরে আসছেন। এর জন্য কাকে দোষারোপ করবো। এরপরও বিষয়টি নিয়ে

মেহেরপুরে গ্রামীণ নারী শ্রমিকরা শ্রমের সঠিক পারিশ্রমিক বঞ্চিত

নারী দিবস আসার আগেই দেশজুড়ে সাজ সাজ রব পড়ে। স্লোগান, পোস্টার, ফ্যাসন হাউসও ম্যাল্টি ন্যাশনালের ছাড়ের ছড়াছড়ি চলে। রেডিও টিভিতে বিজ্ঞাপনের বাহার। নারী তুমি প্রেরণা। নারী তুমি অজেয়। নারী তুমি সেরা। নারী দিবসের আগেই নারী আহামরি। নারীর অবস্থানকে আলোকিত করতে অজস্র কর্মশালা। অভিযান, চায়ের আড্ডায় তর্ক। খুব খুব পেরেছি আমরা। নারীরা সমাজের বড় জায়গায় পৌঁছেছে।

নারীর দু‘চারটি সফলতার গল্প বাদে গ্রাম গঞ্জের লাখ নারী কী পেল? কয়জন ন্যায্য মুজুরি পায়? এসব কথা নারী দিবসে বলা হয় না। এবারতো বড়ই নিরবে চলে গেল নারী দিবস।ছুটির দিন বলে কী? কীন্তু কেন? সরকারি দিবস হলেতো ছুটির দিনেও কারো ছুটি থাকেনা। প্রয়োজনে স্কুল কলেজ থেকে বাধ্যতা মূলক শিক্ষার্থী ধরে এনে সমাবেশ করে দিনটি পালিত হয়।

মেহেরপুরের গ্রামের নারীরাও সর্ব শক্তি দিয়ে পুুরুষের সাথে কাঁধে কাঁধ, হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করছেন রাত দিন। বাসা-বাড়িতে, মাঠে-ঘাটে ও কৃষি জমিসহ সর্বত্র। পার্থক্য- শহরের নারীরা কিছুটা আত্মমর্যাদা ও সম্মান পেলেও গ্রামবাংলার নারীরা আজো অবহেলিত বিভিন্নভাবে। গ্রামীণ শ্রমজীবী নারীরা শহরের বাসা-বাড়িতে কঠোর পরিশ্রম করেন। সে কাজের কোন স্বীকৃতি তো মেলেই না, পান না তেমন মজুরীও। গ্রামীণ নারী শ্রমিকদের ইতিহাস এক অবিচ্ছেদ্য আলোক বিহীন রাতের গল্প। কৃষিতে এবং বাসাবাড়ীতে নারীর ভূমিকা এবং অবদান বর্ণনাতীত। যদিও কর্মক্ষেত্রে অনেক সময় নারী শ্রমিকরা শারিরীক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হন পুরুষ শ্রমিক ও মালিকদের কাছে।

স্বাধীনতাপূর্ব মেহেরপুরের মেয়েদের বাড়ির বাইরে পর্দাবাদে বের হলে সামাজিকভাবে বিচারের মুখোমুখি হতে হতো। সেই মেহেরপুর জেলার নারীরা ঘরের গন্ডি থেকে বেরিয়ে জমিতে ধান চাষ, হাতে হাতুড়ি, মাথায় ঝুঁড়ি, কাঁখে কলসী নিয়ে অভাব অনটন ক্ষুধা আর দারিদ্র্যতা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য সকাল-সন্ধ্যা কাজ করে চলেছেন। ইট-পাথর ভাঙ্গা, মাটি কাটা, সিমেন্ট বালু মিশ্রন, রাস্তাঘাট নির্মাণ ও চা-মিষ্টির দোকানে পানি টানার মতন কঠিন পরিশ্রম করেও ন্যায্য পারিশ্রমিক থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন এসব নারী শ্রমজীবীরা। নারী শ্রমজীবীদের কাজের ঘণত্বর কারণে পুরুষ শ্রমিকদের চেয়ে নারী শ্রমিকের কদর অনেক বেশী। তারপরেও বৈষম্য থেকে শ্রমজীবী নারীরা হাড় ভাঙ্গা পরিশ্রমের পরও ন্যায্য মজুরী থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

মেহেরপুর জেলার ২০টি ইউনিয়নে গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি কৃষিকাজে জড়িত রয়েছে ১০সহস্রাধিক নারীশ্রমজীবী। প্রতিদিন ৪শ টাকা মুজুরিতে ৩হাজার ৭শ জন নারী শ্রমিক গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নে শ্রম বিকাচ্ছেন।

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ষোলটাকা ইউনিয়নে দেখা মেলে গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নে কর্মরত একদল নারী শ্রমিকের। তাদের সেনাপতি সেফালী খাতুন জানান- তাদেরকে প্রতিদিন ৪শ টাকার বিনিময়ে কাজ

করিয়ে নেয়া হয়। বর্ষা বাদলের সময়েও তাদের কাজ থাকে বলে তারা এই কাজ করতে বাধ্য হন। বয়সের সাথে অপুষ্টির শিকার নারি শ্রমজীবী রুবিনা খাতুন (৬৩) জানান. শরীরে শক্তি না থাকার কারণে তাকে কেউ কাজে নেয় না। মেম্বার চেয়ারম্যানদের ধরে গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নে কাজ পেয়েছেন।

এই ইউনিয়নে গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নে ৪০ দিনের কর্মসৃজন প্রকল্পের শ্রমজীবী রাহেলা খাতুন জানান- কিছুদিন আগেও তাদের প্রতিদিনের মুজুরি ছিলো ১শ টাকা। চলতিবছর থেকে প্রতিদিনের মুজুরি হয়েছে ৪শ টাকা। এখন ৪০ দিন পর তাদের বিকাশ কিম্বা রকেটে ৪০ দিনের মুজুরি চলে আসে। তিনি অভিযোগ করেন- বর্তমান সময়ে এই ৪শ টাকাও অনেক কম মুজুরি। জেলায় ইমারত নির্মাণ কাজে শ্রমজীবী নারীর সংখ্যা প্রায় ২ হাজার। পুরুষ শ্রমিকদের মুজুরি ৬শ টাকা হলেও তাদের দেয়া হয় ৪৫০ টাকা করে। জমি থেকে মরিচ সংগ্রহ, কচু ও আলু তোলাসহ মাঠের শ্রমজীবী নারীর কোন পরিসংখ্যান পাওয়া যায়না। ধারণা করা হচ্ছে অন্তত ৩ হাজার হবে এই শ্রমজীবী। কৃষিকাজে একজন পুরুষ শ্রমিকের মুজুরি ৬শ টাকা হলেও নারী শ্রমিকের মুজুরি ৪শ টাকা। কারণ হিসেবে পুরুষ শ্রমিকরা জানায় ‘নারীরা ১শ কেজির কচুর বস্তা মাথায় নিয়ে পরিবহনে তুলতে পারেনা বলেও তাদের মুজুরি কম’।

সমাজকর্মি মাহবুবুল হক মন্টু জানান- আগের চেয়ে গ্রামীণ নারী শ্রমজীবীদের মধ্যে বহুগুনে সচেতনতা বেড়েছে। তাই সময় এসেছে বৈষম্যহীন নারী সমাজ প্রতিষ্ঠার। পুষ্টিতে তুষ্টিতে যুক্তিতে নারীর পাওনা অধিকারকে সমানভাবে প্রাপ্যতা অনুযায়ী সুনিশ্চিত করতে হবে; নারীকেই শিক্ষা প্রশিক্ষণ দিয়ে আরো দক্ষ করে তুলতে হবে। নারী বলে কোনো রকম বৈষম্য অবহেলা করা চলবে না।

জেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা নাহিদা ইসলাম খাতুন জানিয়েছেন নারীরা বর্তমানে বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণ নিয়ে আয়বর্ধণের পথ সুগম করেছেনÑ বর্তমানে নারীদের কষ্টগাঁথা ইতিহাস কেবলী আর্তনাদ আর অমানবিকতায় ভরা বলা যাবেনা। জেলার প্রায় সাত হাজার দুস্থ নারী ৪০ দিনের কর্মসৃজন প্রকল্পে প্রতিদিন ৪শ টাকার বিনিময়ে গ্রামীন অবকাঠামো উন্নয়নে কাজ করছেন।

নারীরা যতদিন পুরুষতান্ত্রিক ধ্যান ধারনায় চালিত হবে, দ্বিচারিতা যতদিন না দুর হবে, ততদিন নারীর অধিকার ড্রয়িংরুমের গল্পগুজবের চেয়ে বিশী এগোবে না।

দর্শনা-গেদে স্থলপথে ১৫ কোটি টাকার রাজস্ব বঞ্চিত সরকার

মহামারী করোনার কারণে ২০২০ সালে ট্যুরিস্ট ভিসা বন্ধ হওয়ার পর আড়াই বছর অতিবাহিত হয়ে গেলেও আজ পর্যন্ত দর্শনা আন্তর্জাতিক স্থলপথ দিয়ে বাংলাদেশী পাসপোর্ট যাত্রীরা ভারতে যাতায়াত করতে পারছেন না। এতে ১৪/১৫টি জেলা শহরের মানুষ যেমন ভোগান্তিতে পড়েছেন, তেমনি গত আড়াই বছরে এই বন্দর থেকে সরকার প্রায় ১৫ কোটি টাকার রাজস্ব হারিয়েছে।

করোনার সংক্রমণ দেখা দেয়ায় ২০২০ সালের ২৬ মার্চ দর্শনা আন্তর্জাতিক রেলবন্দরের মাধ্যমে ভারতীয় মালামাল আমদানি এবং স্থলপথে ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে ট্যুরিস্টসহ সকল ভিসার পাসপোর্ট যাত্রীদের যাতায়াত পুরোপুরি স্থগিত করা হয়। কিছুদিন পর স্বাস্থ্যবিধি মেনে দর্শনা আন্তর্জাতিক রেলপথে ভারত থেকে মালামাল আমদানি শুরু হয়।

২০২১ সালের ১৭ মে থেকে ভারতে আটকাপড়া বাংলাদেশীদের দর্শনা আন্তর্জাতিক স্থলপথের মাধ্যমে দেশে ফেরত আনার একটি নির্দেশনা জারি করা হয়। একই বছরের সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময়ে শুধুমাত্র মেডিক্যাল ও বিজনেস ভিসায় দর্শনা-গেদে হয়ে পাসপোর্ট যাত্রীরা যাতায়াত করতে পারবে বলে পুলিশ জানায়। সব শেষে চলতি বছরের ২৯ মে ঢাকা-কলকাতা মৈত্রী এক্সপ্রেস দর্শনা আন্তর্জাতিক রেল স্টেশনের মাধ্যমে চলাচল শুরু করলেও অদ্যবদি দর্শনা-গেদে স্থলপথে বাংলাদেশীদের জন্য ট্যুরিস্ট ভিসা চালু হয়নি।

কুষ্টিয়ার আড়ুয়া পাড়ার এক বয়স্ক মহিলা পাসপোর্ট যাত্রী দর্শনা চেকপোস্টে দাঁড়িয়ে সাংবাদিকদের জানালেন, কুষ্টিয়া, ঝিনাইদহ, রাজশাহী, পাবনা, ফরিদপুর, মাগুরা, মেহেরপুর, রাজবাড়ী, চুয়াডাঙ্গাসহ এ অঞ্চলের ১৪/১৫টি জেলার মানুষ ট্যুরিস্ট ভিসায় দর্শনা-গেদে স্থলপথে যাতায়াত করতে না পেরে বাধ্য হয়ে বেনাপোল-হরিদাসপুর দিয়ে ভারতে যাচ্ছেন।

এতে প্রচণ্ড গরমের মধ্যে দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে বিড়ম্বনার শিকার

হতে হচ্ছে। যাতায়াত খরচ লাগছে দ্বিগুণ থেকে তিনগুণ। তিনি জানালেন, কুষ্টিয়া, মাগুরা, মেহেরপুরসহ আশপাশের জেলা থেকে দর্শনা চেকপোস্টে আসতে খরচ হয় মাত্র ৫০ থেকে ৮০ টাকা। আর দর্শনা থেকে ভারতের গেদে রেলস্টেশনে হেঁটেই যাওয়া যায়। সেই হিসেবে কুষ্টিয়া থেকে যশোরের ভাড়া একশ’ টাকা, যশোর থেকে বেনাপোলের ভাড়া ৫০ টাকা আর বেনাপোল থেকে ভারতের বনগাঁও রেলস্টেশনে পৌঁছাতে জনপ্রতি খরচ হয় দেড়শো টাকা।

দর্শনা ইমিগ্রেশন কর্মকর্তা জানান, ২০২১ সালের ১৭ মে মেডিক্যাল বিজনেস ভিসা চালু হলেও গত ৫ ডিসেম্বরে তা বন্ধ হয়ে যায়। তবে ভারতীয়রা সব ভিসায় দর্শনা স্থলপথে যাতায়াত করছে। দর্শনা নাগরিক কমিটির সদস্য সচিব গোলাম ফারুক জানান, আন্তর্জাতিক নিয়মানুযায়ী দুই দেশের নাগরিকদের জন্য দুই রকম নিয়ম কোনোভাবেই মেনে নেয়া যায় না।

দর্শনা সিঅ্যান্ডএফ অ্যাসোসিয়েসনের সাধারণ সম্পাদক আতিয়ার রহমান হাবু জানান, দর্শনা-গেদে স্থলপথে ২০২০ সালের আগে প্রতিদিন এক হাজার থেকে ১২ শ’ পাসপোর্ট যাত্রী যাতায়াত করতেন। সেই হিসেবে প্রতিদিন চার-পাঁচ লাখ টাকা অর্থাৎ ৩০ মাসে প্রায় ১৫ কোটি টাকা রাজস্ব থেকে সরকার বঞ্চিত হয়েছে। তা ছাড়া দর্শনা থেকে কলকাতার দূরত্ব মাত্র ১০৭ কিলোমিটার।

দর্শনা কাস্টমস সুপার শুভাশীষ কুণ্ডু জানান, কোভিডের আগে এ পথে প্রতিদিন রমরমাভাবে পাসপোর্ট যাত্রীরা যাতায়াত করতেন। বাংলাদেশীদের জন্য এ পথে ট্যুরিস্ট ভিসা চালু হলে আগের মতোই পাসপোর্ট যাত্রীরা যাতায়াত করবেন।

চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের সাবেক জেলা পরিষদ প্রশাসক মাহফুজুর রহমান মঞ্জু জানান, শিগগিরই দর্শনা-গেদে স্থলপথে ট্যুরিস্ট ভিসা চালু হতে যাচ্ছে। সম্প্রতি লোকমোর্চা ও দর্শনা নাগরিক কমিটির পক্ষ থেকে চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার ও জেলা প্রশাসকের কাছে স্মারকলিপি দেয়া হয়েছে।

চুুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক আমিনুল ইসলাম খান জানান, এ বিষয়ে সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগকে জানানো হবে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে।